بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৭ আগস্ট ২০১৮ মোতাবেক ১৭ যহুর ১৩৯৭ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আজও আমি কয়েকজন বদরী সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব যাদের মধ্যে সর্বপ্রথম রয়েছেন, হযরত আমের বিন রাবিয়াহ্ (রা.)। তার বংশ হযরত উমর (রা.)'র পিতা খাত্তাবের মিত্র গোত্র ছিল, যিনি হযরত আমের (রা.)-কে দত্তক নিয়েছিলেন। এ কারণেই তিনি প্রথমে আমের বিন খাত্তাব নামে সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু পবিত্র কুরআন যখন সবাইকে নিজেদের জন্মদাতা পিতার প্রতি আরোপিত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করে তারপর থেকে আমের বিন খাত্তাবের পরিবর্তে নিজ জন্মদাতা পিতা রাবিয়াহ্'র সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে (তাকে) আমের বিন রাবিয়াহ্ নামে ডাকা আরম্ভ হয়।

এখানে সেসব লোকের জন্য এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে গেল যারা আত্মীয়স্বজনের সন্তান দত্তক নেয় এবং বড় না হওয়া পর্যন্ত তারা জানেই না যে, তাদের জন্মদাতা পিতা কে? জাতীয় পরিচয়পত্র ইত্যাদি বা সরকারি কাগজপত্রেও আসল পিতার পরিবর্তে সেই পিতার নাম থাকে যে তাকে দত্তক নিয়েছে। এ কারণে পরবর্তীতে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। এরপর মানুষ চিঠিপত্র লিখে যে, এমনটি করে দেয়া হোক বা এভাবে করে দেয়া হোক। তাই সব সময় কুরআনের নির্দেশ অনুসারে কাজ করা উচিত। তবে সেসব সন্তানের বিষয় ভিন্ন যাদেরকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পাওয়া যায় বা নেওয়া হয় অর্থাৎ দত্তক নেওয়া হয় এবং তাদের পিতামাতা সম্পর্কে কিছুই বলা হয় না। যাহোক, এই ব্যাখ্যার পর আমি তার সম্পর্কে বর্ণনা করছি।

এই যে বলা হয়েছিল, তিনি তাদের মিত্র ছিলেন আর মৈত্রেয় সম্পর্কের কারণে হযরত উমর এবং হযরত আমের (রা.)'র মাঝে শেষ পর্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় ছিল। তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগেই ঈমান এনেছিলেন। তিনি যখন ঈমান আনেন তখনো পর্যন্ত মহানবী (সা.) দ্বারে আরকামে আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। (করাচির দারুল ইশায়াত থেকে প্রকাশিত সিয়ারুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৩৩,) হযরত আমের (রা.) তার স্ত্রী লায়লা বিনতে আবি হাসমার সাথে ইথিওপিয়া অভিমুখে হিজরত করেন এবং পুনরায় মক্কায় ফিরে আসেন। সেখান থেকে তার স্ত্রীকে সাথে নিয়ে মদীনায় হিজরত করেন। হযরত আমের বিন রাবিয়াহ্ (রা.)'র স্ত্রী মদীনায় হিজরতকারী মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম হিজরতকারী মহিলার সম্মানে সম্মানিতা। বদরসহ সকল যুদ্ধে তিনি মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন। ৩২ হিজরীতে তার ইন্তেকাল হয়। তিনি আন্য গোত্রের সদস্য ছিলেন।

হযরত আমের (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) তাকে বলেন, **'তোমাদের কেউ যদি কোন জানাযা দেখার পর সেই জানাযার সাথে যেতে না চায় তাহলে জানাযার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাওয়া উচিত যতক্ষণ না সেই জানাযা চলে যায় বা রেখে দেয়া হয়।'**

আব্দুল্লাহ্ বিন আমের তার পিতা হযরত আমের (রা.)'র পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, এক রাতে তিনি নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হন, এটি সেই যুগ ছিল যখন মানুষ হযরত উসমান (রা.)'র বিষয়ে মতভেদ করছিল। সে সময় নৈরাজ্যের সূচনা হয়ে গিয়েছিল আর হযরত উসমার (রা.)'র সমালোচনা করা হত। কাজেই তিনি বলেন, নামাযের পর তিনি ঘুমিয়ে পড়েন আর স্বপ্নে দেখেন, তাকে বলা হচ্ছে, উঠ এবং আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া কর, যেন তোমাকে সেই নৈরাজ্য থেকে মুক্তি দেন যা থেকে তিনি তার পুণ্যবান বান্দাদের পরিত্রাণ দিয়েছেন। অতএব, হযরত আমের বিন রাবিয়াহ্ (রা.) উঠেন, নামায পড়েন এবং এরপর তিনি এ বিষয়ে দোয়া করেন। এরপর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এরপর তিনি নিজে আর বাড়ি থেকে বের হন নি বরং তার শবদেহ বেরিয়েছে। {বৈরুতের দারুল কুতুবুল আলমিয়্যা থেকে মুদ্রিত উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১৮-১১৯, আমের বিন রাবিয়াহ্ (রা.)} আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য নৈরাজ্য থেকে রক্ষা পাওয়ার এই অবস্থা সৃষ্টি করেন।

হযরত আমের বিন রাবিয়াহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, তাওয়াফকালে আমি মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলাম। (এমন সময়) মহানবী (সা.)-এর জুতার ফিতা ছিড়ে যায়। আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাকে দিন আমি ঠিক করে দিচ্ছি। মহানবী (সা.) বলেন, এটি কাউকে প্রাধান্য দেয়া আর আমি প্রাধান্য দেওয়াকে পছন্দ করি না। (বৈরুতের দারুল কুতুবুল আলামিয়্যা থেকে ১৯৯৬ সনে মুদ্রিত শরাহ্ যুরকানী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৪৯, আল ফযলুস সানী ফিমা আকরামাহুল্লাহু তা'লা বিহী মিনাল আখলাকিয যাকিয়্যাতে) মহানবী (সা.) স্বহস্তে নিজের কাজ করার বিষয়ে এতটাই সচেতন ও যত্নবান ছিলেন।

এক ব্যক্তি হযরত আমের বিন রাবিয়াহ্ (রা.)'র আতিথ্য গ্রহণ করেন। তিনি তার খুব আদরযত্ন করেন এবং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন আর তার সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর কাছে সুপারিশ করেন। সেই লোক মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে হযরত আমের (রা.)'র কাছে আসেন এবং বলেন, মহানবী (সা.)-এর কাছে আমি এমন একটি উপত্যকা জায়গীর হিসেবে চেয়েছিলাম যা অপেক্ষা উত্তম উপত্যকা গোটা আরবে আর নেই। মহানবী (সা.) সেটি আমাকে দিয়েছেন। এখন আমি এই উপত্যকার একটি অংশ আপনাকে দিতে চাই যা আপনার জীবদ্দশায় আপনার হবে এবং আপনার ইন্তেকালের পর হবে আপনার সন্তানসন্ততির। হযরত আমের (রা.) বলেন, তোমার এই ভূমি খণ্ডের আমার কোন প্রয়োজন নেই কেননা, আজ এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে যা আমাকে এই ইহজগতের কথাই ভুলিয়ে দিয়েছে আর তা হল, اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ। (সূরা আল্ আম্বিয়া: ২) (মুহাম্মদ ইউসুফ আল কান্দালভী রচিত হায়াতুস্ সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫২৩, ইনফাকুস সাহাবা ফি সাবিলিল্লাহ্, ১৯৯৯ সনে মুয়াস্সাসাতুর রিসালা নাশেরুন থেকে প্রকাশিত) অর্থাৎ মানুষের হিসাব গ্রহণের সময় ঘনিয়ে এসেছে তা সত্ত্বেও তারা ঔদাসীন্যের মাঝে নিপতিত।

খোদা তা'লার ভয় ও ভীতির এমন ছিল অবস্থা ছিল সেসব উজ্জ্বল নক্ষত্রের। আর তারাই ছিলেন সেসব মানুষ, যারা সত্যিকার অর্থে ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিতেন।

হযরত আমের বিন রাবিয়াহ্ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, **যায়েদ বিন আমর বলেন, আমি আমার জাতির বিরোধিতা করেছি। ইব্রাহীমের ধর্মের অনুসরণ করেছি। আমি হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর সন্তানসন্ততির মধ্য থেকে এক নবীর আবির্ভাবের অপেক্ষায় ছিলাম যার সম্মানিত নাম হবে আহমদ। কিন্তু মনে হচ্ছে, আমি তাকে পাবো না। আমি তার প্রতি ঈমান**

আনছি, তাঁর সত্যায়ন করছি এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি নবী। তোমরা যদি তাঁর যুগ পাও তাহলে তাঁকে আমার সালাম পৌঁছে দিও। আমি তোমাদেরকে তাঁর এমন লক্ষণাবলী বলছি, ফলে তিনি তোমাদের কাছে গোপন থাকবেন না। তিনি লম্বাও হবেন না আর বেঁটেও হবেন না। তাঁর চুল ঘনও হবে না আবার পাতলাও হবে না। তাঁর চোখে সব সময় লাল আভা থাকবে। তাঁর দু'কাঁধের মাঝে নবুয়তের মোহর থাকবে। তাঁর নাম হবে আহমদ। এই মক্কা নগরী হবে তাঁর জন্মস্থান এবং বয়আত নেয়ার স্থান। এরপর তাঁর জাতি তাঁকে এখান থেকে বহিষ্কার করবে। তাঁর বাণীকে তারা অপছন্দ করবে এরপর তিনি ইয়াসরেব বা মদীনা অভিমুখে হিজরত করবেন। এরপর তাঁর রিসালত জয়যুক্ত হবে। তাঁর বিষয়ে তোমরা প্রতারণার শিকার হয়ো না। আমি ইব্রাহীমের ধর্মের সন্ধানে গোটা শহর চষে বেড়িয়েছি। আমি ইহুদী, খ্রিষ্টান, অগ্নিপূজারী সবাইকে জিজ্ঞেস করেছি। তারা আমাকে বলেছে, এই ধর্ম তোমার পশ্চাতে আসছে। তারা আমাকে সেই লক্ষণাবলী বলেছে যা আমি তোমাদের বলেছি। তারা বলেছে, তার পরে (আর) কোন নবী আসবে না।

হযরত আমের (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) যখন আবির্ভূত হলে আমি তাঁকে (সা.) যায়েদ সম্পর্কে অবহিত করি। তিনি (সা.) বলেন, আমি তাকে জান্নাতে দেখেছি। সে তার আঁচল টেনে হিঁচড়ে হাঁটছিল। (বৈরুতের দারুল কুতুবুল আলামিয়া হতে ১৯৯৩ সনে মুদ্রিত সাবিলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১৬, ফিমা আখবারা বিহিল আহবারু ওয়ার রুহবান ...)

এই যে হাদিস, নবী আসবে না, এর অর্থ এটি নয় যে, মহানবী (সা.) উম্মতী নবী আসার যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন সেটি ভুল বরং এর অর্থ হল, তিনি শেষ শরীয়তধারী নবী আর নতুন কোন শরীয়ত আসবে না এবং যে–ই আসবে তাঁর দাসত্বে আসবে। বিভিন্ন হাদীস এবং কুরআন থেকে আমরা এটিই জানতে পারি।

মহানবী (সা.) হযরত আমের (রা.)'র সাথে হযরত ইয়াযীদ বিন মুনযার (রা.)'র ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেছিলেন। (বৈরুতের দারুল কুতুবুল আলামিয়া থেকে ১৯৯০ সনে মুদ্রিত আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৯৬, ওয়া মান খালাফা বনী আদী) হযরত আমের বিন রাবিয়াহ্ (রা.) হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদতের কয়েক দিন পর ইন্তেকাল করেন। (বৈরুতের দারুল কুতুবুল আলামিয়া থেকে প্রকাশিত উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১৯, আমের বিন রাবিয়াহ্)

দ্বিতীয় সাহাবী হলেন, হযরত হারাম বিন মিলহান (রা.)। হযরত হারাম বিন মিলহান (রা.) ছিলেন আনসারের বনু আদি বিন নাজ্জার গোত্রের সদস্য। তার পিতা মিলহানের নাম ছিল মালেক বিন খালেদ। হযরত হারাম বিন মিলহানের মায়ের নাম ছিল মুলায়কা বিনতে মালেক। তার একটি বোন হযরত উম্মে সুলায়েম হযরত আবু তালহা আনসারী (রা.)'র স্ত্রী এবং হযরত আনাস বিন মালেক (রা.)'র মা ছিলেন। তার দ্বিতীয় বোন হযরত উম্মে হারাম হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.)'র স্ত্রী ছিলেন। হযরত হারাম বিন মিলহান (রা.) হযরত আনাস (রা.)'র মামা ছিলেন। বদর এবং উহুদের যুদ্ধে তিনি যোগদান করেন এবং বি'রে মউনার দিন শাহাদত বরণ করেন। হযরত আনাস বিন মালেক (রা.)'র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, "কিছু লোক মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে বলে, আমাদের সাথে এমন লোকদের প্রেরণ করুন যারা আমাদেরকে কুরআন ও সুন্নতের জ্ঞান শিখাবেন। তিনি (সা.) তাদের সাথে সত্তর জন আনসার সাহাবীকে প্রেরণ করেন যারা কুরআনের ক্বারী ছিলেন। তিনি বলেন, তাদের মাঝে আমার মামা হারামও ছিলেন। এসব লোক কুরআন পড়তেন,

রাতে তারা পরস্পর ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন এবং জ্ঞানচর্চা করতেন। দিনের বেলা পানি এনে মসজিদে রাখতেন, জঙ্গল থেকে লাকড়ি সংগ্রহ করে বিক্রি করতেন এবং সুফ্‌ফাবাসী ও ফকিরদের জন্য খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করতেন। (বৈরুতের দারুল্ কুতুবুল আলামিয়া থেকে ১৯৯০ সনে মুদ্রিত আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৯০, হারাম বিন মিলহান) (আল্ আসাবাহ্, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৭৫-৩৭৬, উম্মে হারাম বিনতে মিলহান, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৪০৮-৪০৯, উম্মে সুলায়েম বিনতে মিলহান, বৈরুতের দারুল্ কুতুবুল আলামিয়া থেকে ১৯৯৫ সনে মুদ্রিত) হযরত হারাম বিন মিলহান (রা.)'র বি'রে মঊনা–সংক্রান্ত ঘটনার বিবরণ আমি কয়েক মাস পূর্বের এক খুতবায় দিয়েছি। বি'রে মঊনার অবশিষ্ট ঘটনা অন্য দু'একটি স্থানেও বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে বুখারীর কতিপয় হাদীস রয়েছে যা ইতোপূর্বে বলা হয় নি এখন সেগুলো উপস্থাপন করছি।

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হযরত হারাম বিন মিলহান (রা.)-কে যখন বি'রে মঊনার ঘটনার দিন বর্শা মারা হয় তখন তিনি তার রক্ত নিজ হাতে নিয়ে স্বীয় মুখমণ্ডল ও মাথায় ছিটিয়ে দেন এবং বলেন, **'ফুযতু বিরাব্বিল কা'বা'**। অর্থাৎ কাবা শরীফের প্রভুর কসম! আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি। (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব গাযওয়াতুর রাজী ওয়া রা'লে, হাদীস নম্বর: ৪০৯২)

হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর কাছে রি'ল, যাকওয়ান, উসাইয়া এবং বনু লাহইয়ান গোত্রের কিছু লোক এসে বলল, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং তারা তাঁর কাছে স্বজাতির মোকাবিলার জন্য সাহায্য চায়। মহানবী (সা.) সত্তরজন আনসারী সাহাবীর মাধ্যমে তাদের সাহায্য করেন। হযরত আনাস (রা.) বলতেন, আমরা তাদেরকে ক্বারী বলতাম। দিনের বেলা তারা কাঠ সংগ্রহ করতেন আর রাতে (নফল) নামায পড়তেন। এরা তাদেরকে নিয়ে যায়। যখন তারা বি'রে মঊনায় পৌঁছায় তখন এরা তাদের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করে তাদেরকে হত্যা করে। মহানবী (সা.) লাগাতার এক মাস, কোন কোন বর্ণনানুসারে চল্লিশ দিন নামাযে দাঁড়িয়ে রি'ল, যাকওয়ান এবং বনু লাহইয়ানের বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে থাকেন। (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস্ সায়র বাবুল আওনি বিল মাদাদ, হাদীস নং: ৩০৬৪, বাবু ইউনকাবু ফী সাবীলিল্লাহ্, হাদীস নং: ২৮০১)

হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, ক্বারীদেরকে যখন শহীদ করা হয় তখন মহানবী (সা.) পুরো এক মাস দাঁড়িয়ে মিনতিভরে দোয়া করেন। বুখারী শরীফের অপর এক বর্ণনায় তিনি বলেন, মহানবী (সা.)-কে এর চেয়ে বেশি শোকাভিভূত হতে আমি আর কখনো দেখি নি। (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল জানায়েয বাবু মান জালাসা ইনদাল মুসীবাহ্... হাদীস নং: ১৩০০)

হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আরেকটি হাদীস রয়েছে, মহানবী (সা.) রুকুর পর দাঁড়িয়ে পুরো এক মাস বনু সুলায়েমের কয়েকটি গোত্রের বিরুদ্ধে দোয়া করতে থাকেন। তিনি বলেন, তিনি (সা.) ক্বারীদের মধ্য থেকে চল্লিশ বা সত্তরজনকে কতিপয় মুশরিক লোকের নিকট প্রেরণ করেন, তখন এই গোত্রগুলো প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় এবং তাদেরকে হত্যা করে, অথচ তাদের এবং মহানবী (সা.)-এর মাঝে চুক্তি ছিল। এরপর এখানেও সেই একই কথা বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ এই কারীদের জন্য তিনি (সা.) যতটা দুঃখ বা শোক প্রকাশ করেছেন আর কারো জন্য এতটা দুঃখ প্রকাশ করতে আমি দেখিনি। (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল জিযিয়াহ্ বাবু দুআইল ইমাম আলা মান নাকাসা আহদা, হাদীস নং: ৩১৭০)

এরপর সীরাত ইবনে হিশামের একটি বর্ণনা রয়েছে। জব্বার বিন সালমা যিনি আমের বিন তোফায়েলের সাথে তখন উপস্থিত ছিলেন পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি

বলেন, যে কারণে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি তা হল, আমি এক ব্যক্তির উভয় কাঁধের মাঝে বর্শাঘাত করি। আমি দেখেছি, বর্শার অগ্রভাগ তার বক্ষ ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। তখন আমি সেই ব্যক্তিকে এটি বলতে শুনেছি, **'ফুযতু ওয়া রাব্বিল কা'বা'**। অর্থাৎ কাবা শরীফের প্রভুর কসম! আমি আমার জীবনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য পেয়ে গেছি। তখন আমি নিজেকে নিজে প্রশ্ন করি, সে কীভাবে সফল হল? আমি কি তাকে শহীদ করি নি? জব্বার বলেন, আমি পরবর্তীতে এই উক্তি সম্পর্কে জানতে চাইলে মানুষ আমাকে বলে, এর অর্থ হল, শাহাদতের সম্মানে ভূষিত হওয়া। জব্বার বলেন, আমি তখন বললাম নিশ্চয় তিনি খোদার দৃষ্টিতে সফলকাম হয়েছে। (২০০১ সনে লেবানন হতে মুদ্রিত আস্ সীরাতুন্ নবুবিয়্যাহ্ লি-ইবনে হিশাম, পৃঃ ৬০৩, হাদীস বি'রে মঊনাহ্ ফী সাফর সানাহ্ আরবা')

দু'তিনজন সাহাবী সম্পর্কে এমনই সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনা ও বাক্য পাওয়া যায়। তারা এমন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন যারা খোদার সন্তুষ্টি অর্জনকে (জীবনের) মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য জ্ঞান করতেন। আর জাগতিক উন্নতি ও সাফল্য তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল না। তাই আল্লাহ্ তা'লাও তাদের এই সংকল্প ও সদিচ্ছার কারণে তাদের সম্পর্কে ঘোষণা করে বলেছেন, আল্লাহ তা'লা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট।

বি'রে মঊনায় শাহাদতের ঘটনার সময় সাহাবীরা আল্লাহ তা'লার কাছে এই দোয়া করেছিলেন, **اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا**। অর্থাৎ, **হে আল্লাহ্! মহানবী (সা.)-কে আমাদের এই অবস্থা সম্পর্কে অবহিত কর যে, আমরা তোমার সাথে মিলিত হয়েছি, আর আমরা তোমার প্রতি আর তুমি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট**। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত জিবরাঈল (আ.) মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন এবং তাঁকে (সা.) এই সংবাদ দেন যে, তাঁর সেসব সাহাবী আল্লাহ্‌র সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছেন আর আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। (আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৭, হারাম বিন মিলহান, ১৯৯৬ সনে বৈরুতের দারুল কুতুবুল আলমিয়্যাহ্ হতে মুদ্রিত)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এই ঘটনা সম্পর্কেও বলেন, বি'রে মঊনা এবং রাজী'র ঘটনাবলীর মাধ্যমে আরব গোত্রগুলো নিজেদের হৃদয়ে ইসলাম এবং এর অনুসারীদের প্রতি কত চরম বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করতো তা জানা যায়। এমনকি ইসলামের বিরুদ্ধে জঘন্যমত মিথ্যা, ধোঁকা এবং প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিতেও তাদের দ্বিধা ছিল না। মুসলমান পরম চৌকস, বুদ্ধিমত্তা এবং জাগ্রত বিবেকের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় মু'মিন সুলভ সুধারণার বশবর্তী হয়ে তাদের প্রতারণার শিকারে পরিণত হত। কুরআনের হাফিয, নামাযী, তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত, মসজিদের এক কোণায় বসে আল্লাহ্‌র যিকরকারী তদুপরি দরিদ্র, কপর্দকহীন এবং অনাহারক্লিষ্ট এ মানুষগুলোই ছিলেন যাদেরকে এই পাষণ্ডরা ধর্ম শেখার ছুতোয় স্বদেশে আমন্ত্রণ জানায়। আর এরপর অতিথি হিসেবে যখন তারা ওদের আবাসস্থলে পৌঁছে, তখন চরম নির্দয়ভাবে তাদেরকে তারা হত্যা করে। এসব ঘটনার ফলে মহানবী যত মর্ম যাতনাই পেতেন তা অপ্রতুল ছিল। কিন্তু তখন তিনি রাজী' এবং বি'রে মঊনার হন্তারকদের বিরুদ্ধে কোন সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি। (তিনি মর্মন্তুদ ব্যথা অবশ্যই পেয়েছেন কিন্তু কোনরূপ সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি।) তবে, এ সংবাদ পাওয়ার পর থেকে লাগাতার ত্রিশ দিন পর্যন্ত প্রতিদিন ফজরের নামাযের ক্বিয়ামে পরম আকুতিমিনতির সাথে রি'ল, যাকওয়ান এবং উসাইয়্যা আর বনী লাহইয়ানের নাম নিয়ে

খোদা তা'লার সমীপে এই দোয়া করেন, **'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের প্রতি করুণা কর। ইসলামের শত্রুদের প্রতিহত কর যারা তোমার ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য এত নির্দয় ও নিষ্ঠুরভাবে নিরপরাধ মুসলমানদের রক্তপাত করছে'**। {মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)এম. এ. কর্তৃক রচিত সীরাত খাতামান্ নবীঈন, পৃ: ৫২০-৫২১}

অতএব, আজও শত্রুর হাতকে প্রতিহত করার জন্য দোয়ার মাধ্যমে খোদা তা'লার সাহায্য যাচনা করা প্রয়োজন। এদের শাস্তির ব্যবস্থা করার জন্য এবং আমাদের জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টির জন্য আল্লাহ্ তা'লাই রয়েছেন।

হযরত সা'দ বিন খওলা (রা.) একজন সাহাবী ছিলেন। কারো কারো মতে তিনি ইবনে আবি রুহ্ম বিন আব্দুল উয্যা আমেরীর মুক্ত কৃতদাস ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং প্রথম যুগের মুসলমানদের মাঝে গণ্য হন। তিনি দ্বিতীয়বার ইথিওপিয়ায় হিজরতকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত সা'দ বিন খওলা (রা.) যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন তখন কুলসুম বিন হিদমের বাড়িতে অবস্থান করেন। ইবনে ইসহাক, মূসা এবং উকবা তাকে বদরে যোগদানকারী হিসাবে উল্লেখ করেছেন। হযরত সা'দ বিন খওলা (রা.) যখন বদরের যুদ্ধে যোগদান করেন তখন তার বয়স ছিল পঁচিশ বছর। উহুদ, খন্দক (পরীখা) এবং হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। হযরত সা'দ (রা.) হযরত সুবাইয়্যা আসলামিয়্যার স্বামী ছিলেন। বিদায় হজ্জের সময় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর কিছুকাল পর তার সন্তানের জন্ম হয়। মহানবী (সা.) তার (বিধবা) স্ত্রীকে বলেন, এই (সন্তান) ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যাকে ইচ্ছা তুমি বিবাহ করতে পার। বিদায় হজ্জের সময় তার ইন্তেকাল সম্পর্কে তাবারী ছাড়া অন্য কেউ দ্বিমত পোষণ করেন নি। তার মতে, তার মৃত্যু (আরো) পূর্বে হয়েছিল। (উসদুল গাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃ: ২০৯-২১০, সা'দ বিন খওলা, ২০০৩ সনে বৈরুত হতে মুদ্রিত) (আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২১৭, সা'দ বিন খওলা, ১৯৯৬ সনে বৈরুত হতে মুদ্রিত)

আরেক জন সাহাবীর নাম হল, হযরত আবুল হাইসাম (রা.)। হযরত আবুল হাইসাম বিন আত্তাইয়্যেহান আনসারী (রা.)'র আসল নাম ছিল মালেক। কিন্ত ডাক নাম আবুল হাইসাম নামেই তিনি সুপরিচিত ছিলেন। তার মা লায়লা বিনতে আতীক বাল্লী গোত্রভুক্ত ছিলেন। অধিকাংশ গবেষকের মতে তিনি অওস গোত্রের শাখা বাল্লী গোত্রভুক্ত যারা বনু আব্দুল আশহালের মিত্র ছিল। (আল্ ইসাবাহ ফী তামঈযিস্ সাহাবাহ্, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৬৫, ১৯৯৫ সনে বৈরুত থেকে মুদ্রিত), (আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৪১ আবুল হাইসাম বিন আত্ তাইয়্যেহান, ১৯৯০ সনে বৈরুত থেকে মুদ্রিত), সিয়ারুস্ সাহাবাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২১৫, আবুল হাইসাম বিন আত্ তাইয়্যেহান, ২০০৪ সনে বৈরুত থেকে মুদ্রিত) মোহাম্মদ বিন ওমর বলেন, হযরত আবুল হাইসাম (রা.) অজ্ঞতার যুগেও প্রতিমা-পূজার প্রতি বিতশ্রদ্ধ ছিলেন এবং এগুলোর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করতেন। হযরত আসা'দ বিন যুরারাহ্ এবং হযরত আবুল হাইসাম (রা.) একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তারা উভয়েই প্রাথমিক যুগের আনসারী যারা মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। (আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৪১, আবুল হাইসাম বিন আত্ তাইয়্যেহান, ১৯৯০ সনে বৈরুত হতে মুদ্রিত) কারো কারো মতে আকাবার প্রথম বয়আতের পূর্বে যখন হযরত আসা'দ বিন যুরারাহ্ ছয়জনের সাথে মক্কা থেকে ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় আসেন আর হযরত আবুল হাইসামকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। যেহেতু তিনি পূর্বেই প্রকৃতিসম্মত (সত্য) ধর্মের সন্ধানে ছিলেন তাই তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর আকাবার প্রথম বয়আতের সময় বারোজনের একটি প্রতিনিধি দল যখন মক্কায় যায় তিনি ছিলেন তাদের একজন ছিলেন। মক্কায় পৌঁছে তিনি মহানবী

(সা.)-এর হাতে বয়আত করেন। (সিয়ারুস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২১৫ আবুল হাইসাম বিন আত্ তাইয়্যেহান, ২০০৪ সনে করাচী থেকে মুদ্রিত)

সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এ সম্পর্কে লিখেছেন, মহানবী (সা.) নির্জনে এক উপত্যকায় তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারা মদীনার সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে মহানবী (সা.)-কে অবহিত করেন। আর এ যাত্রায় সবাই রীতিমত তাঁর হাতে বয়আত করেন। এই বয়আত মদীনায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রথম ভিত্তি প্রস্তর ছিল। তখনও তরবারীর জিহাদের নির্দেশ অবতীর্ণ হয় নি। তাই মহানবী (সা.) তাদের কাছ থেকে শুধু সেসব শব্দের মাধ্যমে বয়আত নেন যেসব শব্দের মাধ্যমে জিহাদের নির্দেশ অবতীর্ণ হবার পর মহিলাদের কাছ থেকে বয়আত নিতেন। অর্থাৎ তা হল, **'আমরা খোদাকে এক অদ্বিতীয় জ্ঞান করবো। শির্ক করবো না, চুরি করবো না, ব্যভিচারে লিপ্ত হবো না। হত্যা থেকে বিরত থাকব। কারো প্রতি অপবাদ আরোপ করবো না। সকল পুণ্যকর্মে আপনার আনুগত্য করব। বয়আতের পর মহানবী (সা.) বলেন, যদি তোমরা সততা এবং অবিচলতার সাথে এই অঙ্গীকারে প্রতিষ্ঠিত থাক তাহলে তোমরা জান্নাত লাভ করবে। কিন্তু যদি তোমরা দুর্বলতা প্রদর্শন কর তাহলে তোমাদের বোঝাপড়া হবে আল্লাহ্‌র সাথে তিনি যেভাবে চাইবেন তোমাদের সাথে ব্যবহার করবেন। ইতিহাসে এই বয়আত বয়আতে আকবা উলা (বা আকাবার প্রথম বয়আত) হিসেবে পরিচিত। কেননা, যেখানে এই বয়আত নেয়া হয়েছিল সেই স্থানকে আকাবা বলা হয় যা মক্কা এবং মিনার মাঝে অবস্থিত। আকাবা শব্দের অর্থ হলো, উঁচু গিরিপথ'**। (মির্যা বশীর আহমদ এম. এ. সাহেব (রা.) রচিত সীরাত খাতামান্ নবীঈন, পৃ: ২২৪-২২৫)

হযরত আবুল হাইসাম সেই ছয়জনের একজন ছিলেন যারা স্বজাতির মধ্য থেকে সর্বপ্রথম মক্কায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর মদীনায় ফিরে এসে ইসলাম প্রচার করেন। তার সম্পর্কে আরও একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনিই সর্বপ্রথম আনসারী (সাহাবী) যিনি মক্কায় গিয়ে মহানবী (সা.)-এর সাথে মিলিত হন। তিনি আকাবা'র প্রথম বয়আতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সকল গবেষকের এই বিষয়ে মতৈক্য রয়েছে যে, আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে যখন মহানবী (সা.) সত্তরজনের মধ্য থেকে যে বারো জন নেতা নিযুক্ত করেছিলেন তিনিও সেসব নেতার একজন ছিলেন। (আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ৩৪১-৩৪২, আবুল হায়সাম বিনুত তায়্যিহান, বৈরুতের দারুল্ কুতুবুল ইলমিয়্যাহ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত) 'নুকাবা' শব্দ নকীব শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হল, যারা জ্ঞানী ও যোগ্যতাসম্পন্ন লোক ছিলেন তাকে তাদের নেতা, সর্দার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়েছিল।

একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আকাবা'র বয়আতের সময় হযরত আবুল হাইসাম নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাদের এবং কতক আরব গোত্রের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতার কিছু চুক্তি রয়েছে। আমরা যখন ইসলাম গ্রহণ করব, বয়আত করে যখন আপনার হয়ে যাব তখন এসব চুক্তির বিষয়ে আপনি যা বলবেন তাই হবে। (আবুল হাইসাম তখন মহানবীর দরবারে নিবেদন করেন,) এখন আমি আপনার কাছে একটি অনুরোধ রাখতে চাই। **'হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার সাথে এখন আমাদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আল্লাহ্ যখন আপনাকে সাহায্য করবেন এবং স্বজাতির বিরুদ্ধে যখন আপনি বিজয় লাভ করবেন তখন আপনি আমাদের ছেড়ে স্বজাতির মাঝে ফিরে যাবেন না আর আমাদেরকে বিরহ বেদনার মাঝে ছেড়ে যাবেন না। মহানবী (সা.) এ কথা শুনে মুচকি হাসেন এবং বলেন,**

তোমাদের রক্ত এখন আমার রক্ত। আর এখন আমি তোমাদের হয়ে গেছি আর তোমরা আমার হয়ে গেছে। এখন তোমাদের সাথে কারও যুদ্ধ করা আমার সাথে যুদ্ধ করার নামান্তর আর এখন থেকে তোমাদের সাথে কারও সন্ধি করা আমার সাথে সন্ধি বলে বিবেচিত হবে'। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, পঞ্চম খণ্ড, পৃ: ৪২৭, হাদীস নং: ১৫৮৯১, বৈরুতের আলামুল কুতুব থেকে ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত)। মহানবী (সা.) মক্কা থেকে হিজরতের পর হযরত উসমান বিন মাযঊন এবং হযরত আবুল হাইসাম আনসারী (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন রচনা করেন। (আল্ ইসাবাহ ফি তামিযিস সাহাবাহ্, সপ্তম খণ্ড, পৃ: ৩৬৫, ইবনুল হাইসাম বিন তাইয়্যেহান, বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ থেকে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত)

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.)'র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, **'মহানবী (সা.) একজন আনসারীর কাছে যান। তার সাথে তার এক সঙ্গীও ছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে বলেন, যদি তোমার কাছে পানি থাকে অথবা যদি তোমার কাছে কলসে ভরা রাতের (ঠাণ্ডা) পানি থাকে তাহলে তা পান করাও নতুবা আমরা এখান থেকেই মুখ লাগিয়ে পান করে নিব। সেখানে প্রবাহমান পানির ধারা বইছিল। সেই ব্যক্তি তার বাগানে পানি সিঞ্চন করছিলেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) আমার কাছে রাতে কলসে রাখা পানি আছে। আপনি এই ঝুঁপড়ি বা কুঁড়ে ঘরের দিকে অগ্রসর হোন। সে ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত আবুল হাইসাম (রা.) তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গী উভয়কে নিয়ে যান এবং একটি পাত্রে পানি ঢালেন। এরপর ছাগলের দুধ দোহন করেন। মহানবী (সা.) এবং তাঁর সঙ্গী উভয়ে সেই পানিয় পান করেন। এটি বুখারীরই রেওয়ায়েত'**। (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল আশরাবাহ্, বাব শারবুল লাবান বিল মা'য়ি, হাদীস নং: ৫৬১৩)

একইভাবে আরেকটি হাদীস রয়েছে, হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবুল হাইসাম বিন আত্ তাইয়্যেহান মহানবী (সা.)-এর জন্য খাবার প্রস্তুত করেন এবং মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের নিমন্ত্রণ করেন। সবার খাবার শেষ হওয়ার পর মহানবী (সা.) সাহাবীদের বলেন, নিজ ভাইকে কোন প্রতিদান দাও। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা এর কী প্রতিদান দিব? মহানবী (সা.) বলেন, কেউ যদি কারও বাড়িয়ে গিয়ে আহার করে আর পানি পান করে, আর এরপর তার জন্য যদি দোয়া করে তাহলে সেটি হবে সেই খাবারের প্রতিদান। (সুনান আবূ দাউদ, কিতাবুল ইতআমাহ্, বাব ফি দুআইর রাব্বিত তা'আমি ইযা আকালা ইনদাহু, হাদীস নং ৩৮৫৩) এটি হল সেই উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা প্রত্যেক মুসলমানের মাঝে থাকা আবশ্যক।

হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) এমন একটি সময়ে ঘর থেকে বের হন যখন সচরাচর কেউ বের হয় না আর কেউ কারও সাথে তখন সাক্ষাতও করে না। এরপর তাঁর কাছে হযরত আবু বকর (রা.) আসেন। মহানবী (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, হে আবু বকর! তোমাকে কোন জিনিষ ঘর থেকে বাহিরে আনলো। (অর্থাৎ, বাড়ী থেকে কেন বের হয়েছ?) আমি নিবেদন করলাম, আমি মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য এবং তার পবিত্র চেহারা দর্শন এবং তাঁকে সালাম দিতে বের হয়েছি। অনতিপরে হযরত উমর (রা.)ও এসে উপস্থিত হন। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, হে উমর! তোমাকে কিসে এখানে নিয়ে এসেছে? উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! ক্ষুধা আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। মহানবী (সা.) বলেন, আমারও কিছুটা ক্ষুধা পেয়েছে। এরপর তাঁরা সবাই হযরত আবুল হাইসাম আনসারী (রা.)'র বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তার কাছে অনেক ছাগল

এবং খেজুর বৃক্ষ ছিল। মহানবী (সা.) তাকে বাড়ীতে পান নি। তিনি আবুল হাইসাম (রা.)'র স্ত্রীকে বলেন, তোমার স্বামী কোথায়? স্ত্রী উত্তরে বলেন, তিনি আমাদের জন্য সুপেয় পানি আনতে গিয়েছেন। স্বল্পক্ষণ পর হযরত আবুল হাইসাম (রা.) পানির কলসি নিয়ে উপস্থিত হন। তিনি কলসিটি এক পাশে রেখে মহানবী (সা.)-কে জড়িয়ে ধরেন আর নিজের প্রাণ ও সম্পদ মহানবী (সা.)-এর চরণে নিবেদন করতে থাকেন। আরও বলেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত। হযরত আবুল হাইসাম (রা.) তিনজনকে নিয়ে বাগানের দিকে যান এবং একটি চাদর বিছিয়ে দেন। খুব দ্রুত বাগানে প্রবেশ করেন এবং পুরো একটি খেজুরের ছড়া কেটে নিয়ে আসেন যাতে কাচাপাকা খেজুর ছিল। মহানবী (সা.) তখন বলেন, হে আবুল হাইসাম! তুমি কাঁচা বা পাকা খেজুর আলাদা করে না এনে পুরো ছড়া কেন কেটে এনেছ? তিনি (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি চাইলাম যে আপনার পছন্দসই পাকা বা কাঁচা খেজুর বেছে নিয়ে খাবেন। তিনি (সা.), হযরত আবু বকর এবং হযরত ওমর (রা.) তিনজনই খেজুর খান এবং পানি পান করেন। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, খোদার কসম! এগুলো হল, সেই নিয়ামত যা সম্পর্কে কিয়ামত দিবসে তোমাদের প্রশ্ন করা হবে। তথা সুশীতল ছায়া, ঠাণ্ডা পানীয় আর তাজা খেজুর। এরপর হযরত আবুল হাইসাম (রা.) মহানবী (সা.)-এর জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছিলেন। মহানবী (সা.) বলেন, দুগ্ধবতী ছাগল জবাই করবে না। এরপর তিনি এক ছাগল ছানা জবাই করেন এবং তা (রান্না করে) মহানবী (সা.)-এর কাছে নিয়ে আসেন আর সবাই (তৃপ্তিসহ) তা খান। মহানবী (সা.) বলেন, তোমার কোন খাদেম বা সেবক আছে কী? হযরত আবুল হাইসাম (রা.) বলেন, না। মহানবী (সা.) বলেন, আমাদের কাছে কোন যুদ্ধবন্দী এলে আমাদের কাছে এসো। মহানবী (সা.)-এর কাছে দু'জন বন্দী আসলে হযরত আবুল হাইসাম (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। তিনি (সা.) বলেন, এই দু'জনের যাকে পছন্দ হয় নিতে পার। হযরত আবুল হাইসাম (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল আপনি নিজেই আমার জন্য পছন্দ করে দিন। মহানবী (সা.) বলেন, যার কাছ থেকে পরামর্শ নেয়া হয় সে আমীন বা বিশ্বস্ত হয়ে থাকে। (হুযূর বলেন, এ কথা সবার নোট করা উচিত। যার কাছ থেকে পরামর্শ নেয়া হয় সে আমানতদার হয়ে থাকে। তাই সবসময় উত্তম পরামর্শ দেয়া উচিত।) তিনি (সা.) বলেন, এই সেবককে নিয়ে যাও কেননা আমি তাকে ইবাদত করতে দেখেছি। মহানবী (সা.) সেই সেবকের যে গুণ বা বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন তাহল, সে ইবাদত করে, আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, তার হৃদয়ে পুণ্য রয়েছে। একইসাথে বলেন, তার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। হযরত আবুল হাইসাম (রা.) তার স্ত্রীর কাছে ফিরে যান এবং মহানবী (সা.)-এর তাকিদপূর্ণ নির্দেশ সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) তোমাকে যে উপদেশ দিয়েছেন এর সুবাদে যে দায়িত্ব ন্যস্ত হয় সেই দায়িত্ব তুমি পালন করতে পারবে না অর্থাৎ সদ্ব্যবহার করা। এক মহিলা এ কথা বলছেন অন্যদিকে কাজ করার মত সেবকও কেউ নেই। কাজের লোক পেয়েও মু'মিনসুলভ বৈশিষ্ট্য দেখুন, তার স্ত্রী তাকে বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এই নির্দেশের প্রতি সুবিচার তখনই হবে যদি তুমি এই যে কৃতদাস পেয়েছ তাকে মুক্ত করে দাও। তখন আবুল হাইসাম (রা.) তাকে মুক্ত করে দেন। {সুনান আত্ তিরমিযী, কিতাবুয্ যুহদ, বাব মা জা'আ ফি মাঈশাতি আসহাবিন নাবিয়্যি (সা.), হাদীস নং: ২৩৬৯} এই ছিল সেসব সাহাবীর পদমর্যাদা।

হযরত আবুল হাইসাম (রা.) বদর, উহুদ, পরিখা এবং খায়বার সহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন। মূতা'র যুদ্ধে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)'র শাহাদতের পর মহানবী (সা.) হযরত আবুল হাইসাম (রা.)-কে খায়বারে খেজুরের ফসলের (উৎপাদন সম্পর্কে) ধারণা নেয়ার জন্যও পাঠিয়েছিলেন। মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর হযরত আবু বকর (রা.) তাকে খেজুরের ধারণা আনার জন্য পাঠাতে চাইলে তিনি যেতে অপারগতা প্রকাশ করেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আপনি মহানবী (সা.)-এর জন্য খেজুরের পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা নেয়ার জন্য যেতেন। তখন হযরত আবুল হাইসাম (রা.) বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর জন্য খেজুরের পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা করতাম আর ফিরে আসার পর, মহানবী (সা.) আমার জন্য দোয়া করতেন। মহানবী (সা.)-এর দোয়া পেতাম –এ কথা মনে পড়ে যাওয়াতে তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। একথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) তাকে আর পাঠান নি। (আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ৩৪২, আবুল হায়সাম, বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত) এই আবেগঘন অবস্থা তিনি তুলে ধরেন। নতুবা তারা এমন মানুষ ছিলেন যারা সর্বাবস্থায় ছিলেন অনুগত আর কখনো অবাধ্য হতেন না। হযরত আবু বকর (রা.) যদি এরপরও নির্দেশ দিতেন তাহলে তা অমান্য করা তার জন্য ছিল অসম্ভব। হযরত আবু বকর (রা.)'র পুনরায় তাকে না বলা সাব্যস্ত করে, তার আবেগ বিজড়িত অবস্থা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কাজেই, তাকে আর নির্দেশ দেন নি। হযরত উমর (রা.) খায়বারের ইহুদীদের যখন দেশান্তরিত করেন তখন তিনি (রা.) তাদের কাছে এমন একজনকে প্রেরণ করেন যিনি তাদের জমির দাম নির্ধারণ করতে পারেন। হযরত উমর (রা.) তাদের কাছে হযরত আবুল হাইসাম (রা.) এবং হযরত ফারওয়া বিন উমর (রা.) এবং হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.)-কে প্রেরণ করেন। তারা খায়বারবাসীর খেজুর এবং জমির মূল্য নির্ধারণ করেন। হযরত উমর (রা.) খায়বারবাসীকে এর অর্ধেক মূল্য দিয়ে দেন যা ছিল পঞ্চাশ হাজার দিরহামেরও অধিক। (কিতাবুল মাগাযী লিল ওয়াকদী, দ্বিতীয় খণ্ড, বাব শানু ফাদাক, পৃ: ১৬৫, বৈরুতের দারুল কিতাবুল ইলমিয়্যাহ থেকে ২০০৪ সালে প্রকাশিত) দেখুন! এবার কিন্তু তিনি ঠিকই গিয়েছেন, এখানে সেই আবেগঘন পরিস্থিতি ছিল না। যেহেতু এক দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল তাই তার যাবার পথে কোন বিষয় বাঁধ সাধে নি।

তার পক্ষ থেকে 'আসসালামু আলাইকুম' বলা সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। হযরত আবুল হাইসাম (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, **'যে 'আসসালামু আলাইকুম' বলে সে দশটি পুণ্য লাভ করে। 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্' যে বলে সে বিশটি পুণ্য লাভ করে আর আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু যে বলে সে ত্রিশটি পুণ্য অর্জন করে'**। (আল্ ইসাবাহ্ ফি তমীযিস সাহাবা, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৬৬, আবুল হাইসাম বিন আত্ তাইয়্যিহান, ১৯৯৫ সালে বৈরুতে মুদ্রিত) হযরত আবুল হাইসাম (রা.)'র মৃত্যুকাল সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। **কারো কারো মতে তার মৃত্যু হয়েছে হযরত উমর (রা.)'র যুগে। আবার কারো কারো মতে তার মৃত্যু বিশ বা একুশ হিজরীতে হয় আর একথাও বলা হয় যে, তিনি ৩৭ হিজরীতে সিফ্ফিনের যুদ্ধে হযরত আলী (রা.)'র পক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়ে শাহাদত বরণ করেন।** (আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৪২, আবুল হাইসাম, ১৯৯০ সালে বৈরুতের দারুল কুতুব আলমিয়্যা থেকে মুদ্রিত) (উসদুল গাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৩, আবুল হাইসাম, মালেক বিন আত্ তাইয়্যিহান, বৈরুতের দারুল কুতুব আলমিয়্যা থেকে মুদ্রিত)

অতএব, এরা ছিলেন সেসব সাহাবী (রা.), আমাদের জন্য যারা উত্তম আদর্শ রেখে গেছেন আর অনেক বিষয় সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিতও করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের পদমর্যাদা ক্রমাগতভাবে উন্নীত করুন।

জুমুআ এবং নামাযের পর আমি দু'জনের গায়েবানা জানাযা পড়াব। প্রথম জানাযা হল, শ্রদ্ধেয় সাহেবযাদা মির্যা মজীদ আহমদ সাহেবের, যিনি হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)'র পুত্র ছিলেন। ২০১৮ সনের ১৪ আগস্ট ৯৪ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ২০০০ সনে যুক্তরাষ্ট্রে তার হার্টের অপারেশন হয়েছিল, এরপর সেখানে পক্ষাঘাত কবলিত হন। এরপর প্রায় শয্যাসায়ীই ছিলেন। ১৯২৪ সনের ১৮ জুলাই কাদিয়ানে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এবং শ্রদ্ধেয়া সরোয়ার সুলতানা সাহেবা পিতা গোলাম হোসেন পেশাওয়ারীর ঘরে তার জন্ম হয়। কাদিয়ানে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। কাদিয়ানের তা'লীমুল ইসলাম হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন। এরপর ১৯৪৯ সনে লাহোরের সরকারী কলেজ থেকে অনেক ভালো নম্বর নিয়ে ইতিহাসে এম, এ পাশ করেন। তিনি পাশ করার পর হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)-কে মানুষ যখন শুভেচ্ছা জানায়, কৃতজ্ঞতার পাশাপাশি হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব তাদেরকে এটিও লিখেছিলেন যে, সত্যিকার অর্থে বিশ্বাসীদের দল নিজেদের সুখ দুঃখের সময় পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। আর পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে প্রশান্তি, দৃঢ়তা ও মজবুতি অর্জন করে। আর এটিই জামা'তভুক্ত হওয়ার মূল লক্ষ্য। তিনি আরো লিখেন, আমি বন্ধুদের কাছে নিবেদন করব এই আনন্দে অংশীদার হওয়ার পাশাপাশি এই দোয়াও করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেখানে স্নেহের মজীদ আহমদকে জ্ঞানের বাহ্যিক মান অর্জনের তৌফিক দিয়েছেন একইভাবে তাকে প্রকৃত জ্ঞানও দান করুন, এরপর এই জ্ঞানের ওপর কার্যত প্রতিষ্ঠিত হওয়ারও তৌফিক দিন। কেননা, এটিই আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য এবং পরম মার্গ। (মাযামীনে বশীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬০৫)

মির্যা মজীদ আহমদ সাহেব ১৯৪৪ সনের ৭ মে ধর্মসেবার মানসে জীবন উৎসর্গ করেন। পাশাপাশি পড়াশোনাও অব্যাহত থাকে। ১৯৪৯ সনের ডিসেম্বর মাসে জামেয়াতুল মুবাশ্বেরীনে ভর্তি হন আর ১৯৫৪ সনের জুলাইতে জামেয়া পাশ করেন। তার বিয়ে হয় ২৮ ডিসেম্বর ১৯৫০ সনে জলসা সালানার তৃতীয় দিনে সাহেবযাদী কুদসিয়া বেগম সাহেবার সাথে। যিনি হযরত নবাব আব্দুল্লাহ্ খান সাহেব এবং হযরত নবাব আমাতুল হাফিয বেগম সাহেবার কন্যা আর বিয়ে পড়ান হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)। তার সন্তানদের মধ্যে বড় কন্যা হলেন নুসরত জাঁহা সাহেবা যিনি হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের পৌত্র মির্যা নাসীর আহমদ তারেক সাহেবের স্ত্রী। তার পুত্র হলেন, মির্যা মাহমুদ আহমদ সাহেব। এরপর রয়েছেন তার এক কন্যা দুররে সামীন, যিনি মীর মাহমুদ আহমদ সাহেবের পুত্রবধূ। তার এক পুত্র মির্যা গোলাম কাদের সাহেব শহীদ আর তার স্ত্রী হলেন, আমাতুন নাসের সাহেবা যিনি মীর সৈয়দ দাউদ আহমদ সাহেবের কন্যা। অতপর তার পঞ্চম কন্যা হলেন, ফায়েযা সাহেবা যিনি সৈয়দ মুদাস্‌সের আহমদ সাহেবের স্ত্রী আর তিনিও ওয়াক্‌ফে যিন্দেগী।

১৯৫৪ সনের জুলাই মাসে শ্রদ্ধেয় সাহেবযাদা মির্যা মজীদ আহমদ সাহেব শাহেদ পাশ করেন। তিনি ১৯৫৪ সনের ২০ সেপ্টেম্বরে প্রথম পদায়িত হন রাবওয়ার তা'লীমুল

ইসলাম কলেজে। ৪ নভেম্বর ১৯৫৬ সনে তাহরীকে জাদীদের অধীনে ঘানার কুমাসিতে স্কুলের অধ্যক্ষ হিসেবে প্রেরিত হন। ১৯৬৩ সনের ২৪ ডিসেম্বর পাকিস্তানে ফিরে আসেন। ১৯৬৪ সনের এপ্রিলে পুনরায় তা'লীমুল ইসলাম কলেজে নিযুক্ত হন। এরপর ভুট্টো সাহেবের যুগে ১৯৭৫ সনের এপ্রিলে তা'লীমুল ইসলাম কলেজকে যখন জাতীয়করণ করা হয় তখন তিনি সেখান থেকে পদত্যাগ করে আঞ্জুমানে রিপোর্ট করেন যে, আমি ওয়াক্‌ফে যিন্দেগী। ১৯৭৫ সনের ৩ জুলাই তিনি নায়েব নাযের তা'লীম হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৭৬ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) যখন আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সফরে যান তখন মির্যা মজীদ আহমদ সাহেব প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)'র সাথে ছিলেন। ১৯৭৮ সনে তাকে নায়েব নাযেরে আলা নিযুক্ত করা হয় আর ১৯৮৪ সনে তিনি এখান থেকেই অবসর গ্রহণ করেন। তার জামাতা সৈয়দ মুদাস্‌সের আহমদ বলেন, সীরাতুল মাহদীর কিয়দাংশ তিনি ইংরেজীতেও অনুবাদ করেছেন। আল্ ফযল পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন। খুবই জ্ঞানপ্রিয় মানুষ ছিলেন। এসব প্রবন্ধ পুস্তকাকারে 'নুকতায়ে নযর' নামে ছাপা হয়েছে। পঠন-পাঠনের গভীর আগ্রহ রাখতেন। আমিও দেখেছি প্রায় সময় লাইব্রেরীতে অধ্যয়নেই কাটাতেন। তার পুত্রবধূ মির্যা গোলাম কাদের শহীদের বিধবা স্ত্রী আমাতুন নাসের সাহেবা লিখেছেন, খুবই স্নেহশীল ও বড় মনের অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন, শিশুদের খুবই ভালোবাসতেন। নিষ্ঠাবান এবং বড় হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। এটি তার অনেক বড় একটি গুণ ছিল, সব বয়সের মানুষের সাথে মিলেমিশে যেতেন। শিশু, বড় এবং যুবক সবার সাথে সমানভাবে বন্ধুসুলভ ব্যবহার করতেন। তিনি আরো লিখেন, **'তার পুত্র মির্যা গোলাম কাদের শহীদের শাহাদতের পর পরম ধৈর্য প্রদর্শন করেছেন। শাহাদতের পর তিনি বলেন, মির্যা মজীদ আহমদ সাহেব এবং তার স্ত্রী শহীদ কাদেরের সন্তানদের অনেক যত্ন নিতেন, দেখাশোনা করতেন। দীর্ঘকাল অসুস্থ ছিলেন, তিনি পরম ধৈর্য এবং মনোবলের স্বাক্ষর রেখেছেন। তার স্বভাবে কোন রাগ ছিল না, যার সাথেই সম্পর্ক রেখেছেন বড় নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক রেখেছেন। একইভাবে গৃহকর্মীদের প্রতিও খুবই যত্নবান ছিলেন।'** তার জামাতা মির্যা নাসীর আহমদ সাহেব লিখেন, **"মির্যা মজীদ আহমদ সাহেব বিভিন্ন বিষয়ে সঠিক ও মূল্যবান মতামত দিতেন, খুবই স্পষ্ট মতামত দিতেন। এমন নয় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের অনুকূলে গা ভাসাবেন, বরং যা সঠিক মনে করতেন সে মোতাবেক নিজের মতামত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতেন।"** আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ ব্যবহার করুন, তার সন্তানসন্ততিকেও তার সৎকাজগুলো ধরে রাখার তৌফিক দিন। সর্বদা খিলাফত এবং জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন।

দ্বিতীয় জানাযা শ্রদ্ধেয়া সৈয়দা নাসিমা আক্তার সাহেবার। তিনি শেখুপুরা জেলার আম্বানুরিয়া গ্রামের মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। ২০১৮ সনের ২৭ জুলাই তিনি ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত ওলী মোহাম্মদ সাহেবের পৌত্রী এবং কাজী দ্বীন মোহাম্মদ সাহেবের কন্যা ছিলেন। দেশ বিভাগের পর তার পিতা পরিবারসহ কাদিয়ান থেকে রাবওয়ায় স্থানান্তরিত হন। বিয়ের পর তিনি আম্বানুরিয়া গ্রামে জীবন কাটান। সে সময় জামা'তি বিভিন্ন পদে সেবা করার তৌফিক পেয়েছেন। ১৮ বছর স্থানীয় মজলিসের লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্টও ছিলেন। নামায,

রোযায় অভ্যস্ত ছিলেন, নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তেন, গরীবদের লালন পালনকারী, প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহারকারিনী, বড় সরল প্রকৃতির এক নিষ্ঠাবতী নারী ছিলেন। নিয়মিত অনুবাদসহ কুরআন পাঠ এবং প্রণিধানের অভ্যাস ছিল আর এর ওপর অনুশীলন করারও চেষ্টা করতেন। শিশুদেরকে কুরআন পড়াতেন আর বিপুল সংখ্যক আহমদী-গয়ের আহমদী তার কাছে কুরআন পড়েছে। তার এক পুত্র পশ্চিম আফ্রিকার মালিতে জামা'তের মুবাল্লিগ হিসেবে কর্মরত আছেন। পশ্চিম আফ্রিকার মালীতে যখন তিনি নিযুক্ত হন তখন এবোলা মহামারির প্রকোপ ছিল। তখন কোন অআহমদী তাকে বলে, এমন পরিস্থিতিতে আপনার ছেলেকে সেখানে পাঠানো উচিত নয়। সেখানে মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন, আমি আল্লাহ্‌র কাছে অনেক দোয়ার পর আমার উভয় পুত্রের (তার দুই পুত্রই ওয়াক্‌ফে যিন্দেগী এবং জামা'তের মুরব্বী) জীবন উৎসর্গ করেছি। ওয়াক্‌ফের পর এরা আল্লাহ্‌র। আমি এখন ভ্রুক্ষেপ করি না যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের কাছ থেকে কোথায় কীরূপ সেবা গ্রহণ করবেন। আমি এ বিষয়ে অনেক গর্বিত যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার সন্তানদেরকে খিদমতের তৌফিক দিয়েছেন। সন্তানদেরও তিনি উপদেশ দিতেন যে, আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু সেবার তৌফিক দিয়েছেন তাই সব সময় আল্লাহ্ এবং নিজ ওয়াক্‌ফের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে। তিনি ওসীয়্যতকারীনিও ছিলেন। তার পুত্র নাসের আহমদ সাহেব, মালী জামাতের মুবাল্লিগ আর আনসার মাহমুদ সাহেব মুরব্বী সিলসিলাহ্ হিসেবে পাকিস্তানে (কর্মরত) রয়েছেন। মালীতে যে পুত্র রয়েছেন তিনি জানাযায়ও যোগ দিতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তাকেও ধৈর্য এবং দৃঢ় মনোবল দিন আর মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার বংশধরদের মাঝে তার পুণ্যকে জীবিত রাখুন। (আমীন)

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)